(গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ক্যাব ও বিআইবিএম কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল নিবন্ধ)

ব্যাংকের সেবা প্রদায়ক চরিত্র

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

ব্যাংকের গ্রাহক নির্ভরতাঃ

নিবন্ধিত কোম্পানী হিসাবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য নিবন্ধিত কোম্পানীর সাথে ব্যাংকের প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য কোম্পানী পরিচালিত হয় কোম্পানী আইন অনুসারে। ব্যাংক পরিচালিত হয় ব্যাংক কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী। ব্যাংক কোম্পানী আইন প্রণয়নের একটা পটভূমি রয়েছে।

শেয়ার হোল্ডারদের কছে থেকে মূলধন সংগ্রহ করে কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত কোম্পানী ব্যবসা পরিচালনা করে। এসব কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দই ষ্টেক হোল্ডার। লাভ-লোকসান তাদের। কোম্পানীর ক্ষতি হলে শেয়ার হোল্ডার ছাড়া আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হন না। কোম্পানী দেউলিয়া হলে বা বন্ধ হয়ে গেলে শেয়ার হোল্ডার ছাড়া অন্য কারো তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতে হয় না। কোম্পানী পরিচালিত হয় মালিকদের অর্থে। তাই দায়দায়িত্বও তাদেরই। মালিক নির্ভর চরিত্র থেকে ব্যাংক কোম্পানীগুলো অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যান্য কোম্পানীর মত ব্যাংক কোম্পানীও শেয়ারহোল্ডারদের পরিশোধিত মূলধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরিশোধিত মূলধন ব্যাংকের মোট পরিচালনা-মূলধন বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। পরিচালন মূলধনের বিরাট অংশ প্রদান করে আমানতকারী জনগণ। উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, কোন ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন যদি এক হাজার কোটি টাকা হয়, তাহলে ঐ ব্যাংকের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হবে কমবেশী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ পরিশোধিত মূলধনের পঞ্চাশ গুণ। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনায় মালিকের অংশ পশ্চাশভাগের একভাগ, বাকী অংশের মালিক আমানতকারী জনগণ। ব্যাংক যে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে, সেটাই ব্যাংকের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ব্যাংকের বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমানতকারীর অর্থ আটকে যায়। কাজেই ব্যাংক ব্যবসায় বড় ঝুঁকি আমানতকারীদের। মালিকের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। যদিও আমানতকারীর ক্ষতি পূরণ করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত মালিকদের উপর বর্তায়। ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমানতকারীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ বিশ্লেষন থেকে বলা যায়, অন্যান্য কোম্পানীর পুরো ঝুঁকি মালিকের আর ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে ঝুঁকির বড় অংশ আমানতকারী জনগনের এবং ক্ষুদ্র অংশ শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের ।

আমানতকারীগণ ব্যাংকের সেবা গ্রহণকারী। সেবা গ্রহনকারীদের ঝুঁকি বিবেচনা করে ব্যাংকের দায়িত্ব শুধুমাত্র মালিকপক্ষের কাছে সমর্পন করা হয় নাই, যেমনটা রয়েছে অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে

আইনকরে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেবা ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর। বাংলাদেশ বাংক এই দায়িত্ব পালন করে থাকে ব্যাংক কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী।

গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালক নিয়োগের বিধান রয়েছে। যেহেতু তাঁরা শেয়ার হোল্ডার নন এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, সেহেতু তারা স্বাধীনভাবে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষনের যোগ্যতা রাখেন। তত্ত্বগতভাবে বিষয়টি সঠিক। ভারতসহ বিভিন্নদেশে শেয়ার হোল্ডারদের পরিচালকদের সাথে আমানতকারীদের স্বার্থের সংঘাত হলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালকেরা আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষনে তৎপর থাকেন, এমন নজির রয়েছে। বাংলাদেশে অনুরূপ কৃষ্টি সৃজনে আরো অনেকদূর যেতে হবে। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে ব্যাংকের নির্বাহীদের। কারণ তারা ব্যাংকিং আইন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি-বিধান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেন। রাষ্ট্রের কর্মকর্তাবৃন্দ যেমন প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, দলীয় সরকারের নন; তেমনি ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পরিচালনা পর্ষদের নন। তারা আইনের অধীনে কাজ করেন এবং আইন দ্বারা পরিচালিত। এ কারণে আমানতকারীদের আইনসংগত স্বার্থ সংরক্ষনে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সুরক্ষা দান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য সকল স্তরের কর্মকর্তাকে সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব বর্তায় প্রধান নির্বাহীর উপর। বিধান অনুযায়ী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর নিয়োগ এবং অপসারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হবে না। এমন কি প্রধান নির্বাহী পদত্যাগপত্র পেশ করলেও বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত করে দেখবে যে, পর্ষদ বা কোনপক্ষের চাপে পদত্যাগ করতে হচ্ছে কি না। ২০১৩-১৪ সালে কয়েকটি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে পদত্যাগ করার জন্য চাপসৃষ্টি করা হয়েছিল মর্মে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা তথা আইনানুগভাবে কর্ম পরিচালনায় ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ সহায়ক শক্তি হিসাবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের স্খলন শুধু অনৈতিকই নয়, আসদাচরণও বটে।

ব্যাংকের গ্রাহক নির্ভরতা কত গভীর, তা 'ব্যাংকার' এর আইনী সংজ্ঞাতেই প্রতিভাত হয়েছে। নেগেশিয়েবল ইনস্টুমেন্ট এক্টের ৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে যে, ব্যাংকার হলো এমন একটি লিগাল পার্সন (কোম্পানী), যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করবে এং বিনিয়োগ করবে এই শর্তে যে, চাহিবা মাত্র আমানতকারীকে তার জমা অর্থ ফেরৎ দিতে হবে।' কোন ব্যাংকের সকল আমানতকারী যদি একই সময়ে তাদের জমাকৃত সকল অর্থ ফেরৎ চায়, তাহলে আইন অনুসারে ব্যাংক টাকা দিতে বাধ্য থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে পড়বে। এমনটা ঘটে না ব্যাংক এবং আমানতকারীদের পারস্পরিক আস্থা এবং সমঝোতার কারণে। বলা হয়ে থাকে, ব্যাংকের ভিত্তি হলো আমানতকারীর আস্থা। শেয়ার হোল্ডারদের

পরিশোধিত মূলধন ব্যাংককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। বরং আমানতকারীর আস্থাই ব্যাংকের হৃদযন্ত্র সচল রাখে। ব্যাংকের গ্রাহক নির্ভরতাই গ্রাহকের রক্ষা কবচ।

ব্যাংকের সেবাসমূহ ঃ

বিগত এক শতাব্দীর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ব্যাংকের সেবা স্থির বা স্থবির নয়। যুগ পরিবর্তনে মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন সেবা সৃষ্টি হয়েছে আবার কোন কোন সেবা পরিত্যক্তও হয়েছে। ব্যাংকারদের সৃজনশীলতার ফলশ্রুতিতে একদিকে নতুন সেবা উদ্ভাবিত ও সংযোজিত হয়েছে, অন্যদিকে গ্রাহকদের সচেতন ও অনুপ্রাণিত করে চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ব্যাংকিং সেবা গতিশীল। প্রবাহমান নদীর মত। প্রবাহ বন্ধ হলে বা সেবা স্থবির হয়ে পড়লে, ব্যাংকের অপমৃত্যু ঘটে থাকে।

অর্থনীতিতে ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা হলো 'ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন' বা 'আর্থিক মধ্যস্থতা'। অর্থাৎ সঞ্চয়কারীর উদ্বৃত্ত সঞ্চয় আহরণ করে বিনিয়োগকারীকে ঋণ প্রদান করা। বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জন করে, মুনাফার একটি অংশ আমানতকারীকে প্রদান এবং বাকী লভাংশ দ্বারা ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা। আমানতকারী বিনা ঝুঁকিতে কিছু আয় করেন। উদ্যোক্তা মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে পারেন। ব্যাংকের এই মধ্যস্থতার কাজটি অত্যন্ত জটিল ও টেকনিকাল। সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সব পক্ষের মঙ্গল। ভুল সিদ্ধান্তে সর্বনাশ। এজন্য ব্যাংকারকে হতে হয় সৎ, জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ। তাকে হতে হয় জনগণের আস্থা অর্জনকারী।

আমানত বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রধানতঃ আমানত তিন প্রকারঃ চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদী। ব্যবসায়ী বা নিয়মিত জমা-উত্তোলন করতে হয় এমন সেবাগ্রহণকারীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন। চলতি হিসাবে মুনাফা প্রদান করা হয় না। বৃটিশ শাসনামলে চলতি হিসাবে টাকা রাখার 'নিরাপত্তা' ব্যয় বাবদ আধা থেকে এক পার্সেন্ট খরচ কাটা হত। এখন তা হয় না, তবে ষান্মাসিক ভিত্তিতে হিসাব রক্ষন ও পরিচালনা ব্যয় হিসাবে সার্ভিস চার্জ কর্তন করা হয়। এটি সব ব্যাংকে সমান নয়। সাধারনভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে সবচেয়ে কম, দেশীয় প্রাইভেট ব্যাংকে একটু বেশী এবং বিদেশী ব্যাংকে অনেক বেশী।

যারা উদ্বৃত্ত সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখতে চান এবং প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে টাকা তুলতে চান, তাদের জন্য রয়েছে 'সঞ্চয়ী হিসাব'। এ হিসাবে প্রতিদিন বা প্রয়োজন মত জমা করা যাবে। তবে সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার টাকা তোলা যাবে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে সপ্তাহে একাধিকবার তুলতে দেয়া হয় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের নিরিখে। সঞ্চয়ী হিসাবের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাবের প্রচলন রয়েছে। সন্তানদের শিক্ষার জন্য সঞ্চয়, মেয়েদের বিয়েশাদীর জন্য সঞ্চয়, হজ্ব করার নিয়েতে ধীরে ধীরে সঞ্চয়, ব্যবসার ক্ষুদ্র মূলধন গড়ে তোলার জন্য সময়ভিত্তিক সঞ্চয়- এমনি অনেক উদ্ভাবনী

সঞ্চয় প্রকল্প বিভিন্ন ব্যাংকে রয়েছে। এসব হিসাবে সঞ্চয়ের সাথে সাথে মুনাফাও যোগ হয়ে থাকে।

যারা নির্দিষ্ট অংকের সঞ্চয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক মুনাফায় জমা রাখতে চান, তাদের জন্য রয়েছে 'মেয়াদী আমানত' বা ফিক্সড ডিপোজিট। তিনমাস, ছ'মাসে, এক বছর, দু'বছর বা তিন বছরের মেয়াদে জমা রাখা যায়। মেয়াদ যত বেশী, মুনাফাও তত বেশী। মেয়াদান্তে মুনাফাসহ আসল টাকা পাওয়া যায়। জরুরী প্রয়োজনে মেয়াদপূর্তির আগে টাকা তুলতে চাইলে জরিমানা দিয়ে টাকা তোলা যায়। সাধারণতঃ অর্জিত মুনাফা থেকেই জরিমানা আদায় করা হয়। সঞ্চয়ীর মত মেয়াদী আমানতেও লাভজনক প্রকল্প রয়েছে। যথা, 'লাখপতি হিসাব', ছ'বছরে অর্থদ্বিগুণ' 'পাঁচ বছরে শিল্পের প্রকল্প' 'দশ বছরে হজ্বযাত্রা' ইত্যাদি।

সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে প্রাথমিক জমা ব্যাংক ভেদে ৫০০/- থেকে ১০,০০০/- পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার ন্যুনতম স্থিতি জমা রাখার নিয়মও রয়েছে। ফলে অনেকের পক্ষে ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয় না। সাম্প্রতিককালে অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যাংকিং নীতিমালা গ্রহণের ফলে, দারিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য মাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমায় ব্যাংক হিসাব খোলা হচ্ছে। এক কোটির অধিক মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এসব হিসাবে কোন সার্ভিস চার্জ কাটা হবে না। ন্যুনতম স্থিতির শর্তও নেই। ফলে স্বল্পবিত্তের মানুষ দশটাকার হিসাব খুলে দু'চার টাকা করে জমিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজি গড়ে তুলতে পারবেন। নিদেনপক্ষে, আপদকালীন সময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় জমা করতে পারবেন।

সঞ্চয়সেবার পরেই আসে বিনিয়োগ সেবা। বিনিয়োগ সেবার আওতায় রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঋণ। শিল্প, ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানী, কৃষি ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহনির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের ধরনও অনেক রকম। প্রকল্পঋণ, চলতি মূলধনঋণ, ওয়ার্ক অর্ডার ঋণ, ঋণপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রকারভেদে ঋণের আকার বা অঙ্ক ও বিভিন্ন রকম। একটি বড় প্রকল্প ঋণ যেমন কয়েক হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে, তেমনি একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য কয়েক হাজার, এমন কি কয়েকশত টাকার ঋণও বিবেচিত হতে পারে। ছোট অঙ্কের ঋণ মাইক্রো ক্রেডিট নামে পরিচিত। 'স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ' সংক্ষেপে এস.এম.ই নামে একধরনের ছোট ও মাঝারি ঋণ এখন বেশ প্রচলিত। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্ন্তভূক্তিমূলক ব্যাংকিং বা Inclusive Banking এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র-মাঝারি ঋণ, কৃষিঋণ তথা গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচীর সংখ্যা এত বেশী যে প্রতিটির নাম উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, বৈধ যে কোন প্রকার উৎপাদনশীল এবং লাভজনক কর্মকা- ঋণ প্রদান করা হয়। বেশ কিছু সেবাখাতেও ঋণ দেয়া হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক প্রবাসীদের বিদেশ গমনের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

আমানত ও ঋণসেবা মূল সেবা হিসাবে চিহ্নিত। এর বাইরে Ancillary Service বা সহায়ক সেবা হিসাবে ব্যাংক অনেক ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। এর পরিপূর্ণ তালিকা প্রদান সুকঠিন। বহুল ব্যবহৃত সেবাগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। আমদানি ও রপ্তানীকারকের পক্ষে ব্যাংক বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরিন ঋণপত্র খুলে থাকে। ঋণপত্র এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র, যার মাধ্যমে পণ্য প্রেরণকারী মূল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায়। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ব্যাংক কমিশন গ্রহণ করে থাকে। একইভাবে গ্রাহকের পক্ষ থেকে অন্যপক্ষকে অর্থপ্রাপ্তির আরেক ধরনের সেবার নাম ব্যাংক-গ্যারান্টি। গ্যারান্টির প্রেক্ষিতে গ্রাহককে নগদ অর্থ প্রদান করতে হয় না। এক্ষেত্রেও ব্যাংক কমিশন পেয়ে থাকে। মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদ রক্ষনের জন্য ব্যাংক 'সেফ-কাষ্টডি' এবং লকার-ভাড়া' উভয়বিধ সেবা প্রদান করে। সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার ইন্টারনেট টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে ব্যাংকিং সেবার সহজীকরণ এবং ব্যপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ.টি.এম বুথের মাধ্যমে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা টাকা তোলা যায়। ব্যাংকের একশাখার টাকা অন্য যে কোন শাখা থেকে তোলা যায়। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে দিনেদিনেই অর্থ প্রেরণ করতে পারে। দেশের মধ্যেও এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ প্রেরণ সহজ হয়েছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, ওয়াসার বিল, পৌরকর প্রভৃতি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজেই পরিশোধ করা যায়। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড প্রভৃতির ব্যবহারে নগদ টাকা বহন করার ঝুঁকি কমে এসেছে। কার্ডের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাও নগদ বহন করার প্রয়োজন হয় না। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, ব্যাংকিং সেবা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এ কারণে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতার ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা এবং সন্তুষ্টি।

গ্রাহকদের কিছু প্রশ্ন, দ্বিধা ও সমস্যা

অন্তর্ভূক্তিমূলক (inclusive) ব্যাংকিং নীতি-কৌশলের কারণে বাংলাদেশে ব্যাংক-গ্রাহকদের সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্বেও এখনো জনসংখ্যার বিরাট অংশ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে। দারিদ্র এবং অশিক্ষা এর বড় কারণ হলেও অনেক ক্ষেত্রে আস্থাহীনতা এবং সহজলভ্যতার অভাব বিদ্যমান। সেবার উচ্চমূল্যের অভিযোগও রয়েছে।

গ্রাহক সন্তুষ্টি ঃ ব্যাংক সেবায় গ্রাহক সন্তুষ্টি নিয়ে মাঝে মধ্যেই গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের ইনভেষ্টিগেটিভ রিপোর্ট থেকেও ধারণা পাওয়া যায়। গ্রাহক সন্তুষ্টির বহুমাত্রিক দিক রয়েছে। পেশাগত দিকে রয়েছে স্বল্পসময়ে দক্ষতার সাথে সঠিক প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান করা। মনস্তাত্বিক সন্তুষ্টি নির্ভর করে গ্রাহক মন-মানসের উপর এবং তার ব্যক্তি স্বীকৃতির উপর। এটি অবশ্যই একটি জটিল প্রক্রিয়া। 'টাইম এন্ড মোশন' ষ্টাডি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (ক) ছোট শাখায় লেনদেন মোটামুটি স্বল্পসময়ে সম্পন্ন হয়; (খ) বড় শাখায় অনাকাঙ্খিত বিলম্বের অভিযোগ রয়েছে; (গ) রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকের তুলনায় ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকে লেনদেন দ্রুততর হয়ে থাকে; (ঘ) বড় শহরের তুলনায় ছোটশহরে ও পল্লী এলাকার শাখায়

লেনদেন সম্পন্ন করতে কম সময় লাগে, (ঙ) বিদ্যুৎ বিল ও গ্যাস-পানির বিল পরিশোধ করতে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় এবং গ্রাহককে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। চেক ক্লিয়ারিং এর বিষয়ে বিলম্বের অভিযোগ নেই বল্লেই চলে। তবে দুরবর্তী শাখা থেকে চেক কালেকশনের বিষয়ে বিলম্বের অভিযোগ কখনো শোনা যায়। তাছাড়া চেক হারিয়ে যাওয়ার কিছু অভিযোগও মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

সার্ভিস চার্জ ঃ গ্রাহকদের একটি বড় অভিযোগ বড় অংকের সার্ভিস চার্জ আদায় করা নিয়ে। ব্যাংকারদের যুক্তি হলো, কার্য পরিচালনা এবং সেবা প্রদানের খরচ তারা সার্ভিস চার্জ হিসেবে আদায় করে থাকেন। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ চার্জের পরিমান নিয়ে। তারা চার্জ দিতে রাজী। কিন্তু চার্জের নামে বড় অংক একাউন্ট থেকে কেটে নেওয়াকে তারা পকেট কাটার সাথে তুলনা করেন। সমীক্ষা থেকে সার্ভিস চার্জের ট্রেন্ড বা গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। সার্ভিস চার্জ সর্বনিম্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমুহে। প্রাইভেট ব্যাংকের চার্জ তার চাইতে বেশ বেশী। বিদেশী ব্যাংকগুলোর সার্ভিস চার্জ রীতিমত আকাশ ছোঁয়া। গ্রাহকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার এবং চার্জ তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে অবগতির জন্য প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত চার্জ আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, পত্র বা বার্তা প্রেরণের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের চার-পাঁচ গুণ পর্যন্ত আদায় করা হয়। ব্যাংকের মুনাফার অংক স্ফীত করার জন্যই এ কৌশল।

মুনাফার হার ঃ আরেকটি বড় অভিযোগ ব্যাংকের মুনাফা বা সুদের হার সম্পর্কিত। ব্যবসায়ীরা দাবী করেন, এত উচ্চসুদ হারে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা সুকঠিন। বানিজ্যিক ব্যাংকে ঋণের সুদহার বর্তমানে মোটামুটিভাবে ১২% থেকে ১৪%। এর চেয়ে বেশী হার ধার্য করার অভিযোগও রয়েছে। বহিবিশ্বের সাথে তুলনা করলে এই হার অনেক বেশী। ইউরোপে ঋণের ওপর সুদের হার শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগের মধ্যে। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরে এই হার ৫ থেকে ৭ শতাংশ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ঋণের সুদের হার একক সংখ্যা অর্থাৎ ৯ এ নেমে এসেছে। উল্লেখিত হার ওঠানামা করে। কিন্তু বেশী না। বাংলাদেশে বেশী সুদ-হারের মূল কারণ দু'টি- (১) দুর্নীতি এবং অদক্ষতার জন্য বড় অংকের শ্রেণীবিনাসিত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রক্ষণ এবং (২) ব্যাংক-মালিকদের অধিক মুনাফা অর্জনের লোভ। ব্যাংক মালিকেরা প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যক্তি। তারা লোভ সংবরণ না করলে, পূঁজি প্রত্যাশী নতুন ও ছোট ব্যবসায়ীদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে থাকবে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ পূর্ণতা পাবে না। দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্দ ঋণ কমিয়ে আনতে হবে এবং ব্যাংক মালিকদের গণদাবীর চাপে ফেলতে হবে যাতে তারা লভ্যাংশ কমিয়ে সুদহার হ্রাস করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য, ব্যাংক মালিকেরা দ্বৈত ভূমিকা রাখছেন। ব্যবসায়ীদের চেম্বার থেকে তারা সুদহার কমানোর দাবী জানান। আবার তারাই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় বসে উচ্চ সুদহার ধার্য করেন।

স্মরণ করা যেতে পারে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রচলনের পর থেকে সুদহার নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ নেই। তবুও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদহার কমানোর জন্য অনুরোধ করে এবং উৎসাহ দেয়। কিন্তু ব্যাংক মালিকেরা এসব অনুরোধে কর্ণপাত করেন না। মুনাফা বা লাভ এখন লোভে পরিনত হয়েছে। কনজিউমার্স এসোসিয়েশন সহ ভোক্তা সংগঠনগুলোকে এ বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে।

ভোক্তা বৈষম্যঃ

স্বাধীনতার পর ব্যাংক সেবায় ঘাটতি থাকলে ও গ্রাহক বা ভোক্তা বৈষম্য ছিল না। ছোট-বড় সবাই ব্যাংক-সেবায় সমান অধিকার পেতেন। ব্যক্তিখাতে ব্যাংক সম্প্রসারণের পর থেকে সেবার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভোক্তা বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে অল্প টাকা লাগে, গড় স্থিতির বিষয়েও কড়াকড়ি নেই। অর্থাৎ স্বল্পবিত্তের মানুষ সরকারী ব্যাংকের গ্রাহক হতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রাইভেট ব্যাংকে তুলনামূলক বেশী টাকা দিয়ে হিসাব খুলতে হয়। বিদেশী ব্যাংকে ধনী না হলে একাউন্ট খোলাই যায় না। তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করনীয় কিছু নেই। তবে বৈষম্যের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব।

আমানতের নিরাপত্তাঃ আমানতকারীর মৌলিক অধিকার তার আমানতের নিরাপত্তা। কিন্তু হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ সহ বড় বড় দুর্নীতি ও ঋন-কেলেঙ্কারীর প্রেক্ষিতে গ্রাহকদের মৌলিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স স্কীম রয়েছে। তাছাড়া সরকারী ব্যাংকের দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারীর ফলে উদ্ভূত ঘাটতি নিরসনের জন্য সরকার অনৈতিকভাবে হলেও ঐ সব ব্যাংকগুলোকে বাজেট থেকে ঘাটতি মূলধন পূরনের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু সে অর্থও তো জনগণের ট্যাক্সের টাকা। এ বিষয়ে নিয়ে জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ভোক্তাদের সোচ্চার হতে হবে।

জনগণের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে যেমন গণতন্ত্র থাকে না, মানুষ বঞ্চিত হয়, তেমনি ভোক্তাদের সক্রিয় সচেতনতা না থাকলে তারা ঠকতেই থাকবে। এজন্য ভোক্তাদের সাংগঠনিক মঞ্চকে সক্রিয় থাকতে হবে। কনজিউমার্স এসোসিয়েশনের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ের এই সংগঠনের সাথে সংহতি রেখে খাত-ভিত্তিক ভোক্তা সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। ব্যাংক-গ্রাহকদের একটি খাত-ভিত্তিক ভোক্তা সংগঠন এখন সময়ের দাবী। ব্যাংকের দুর্নীতি ও আর্থিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা ওয়াচ-ডগের ভূমিকা পালন করতে পারে। বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে এ ধরণের খাত-ভিত্তিক ভোক্তা সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে ক্যাবের (CAB) কর্মকাে-র সাথে Synergy সৃষ্টি হবে এবং সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সমন্বয় হবে। CAB এ প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিতে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে পারে।